ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

খাজা আহমদ আব্বাসের *রিটার্ন টিকেট* : জীবন-সঙ্গতির সন্ধান

ড. উন্মে কুলসুম আকতার বানু*

Abstract: Khaja Ahamad Abbas is a renowned author of prose fiction in modern Urdu literature. Except having the entity of a author of prose fiction, he is a playwriter, columnist and film maker. In his literary works it is to find the conspicuous aspects of society. ÔHuman beingÕ is magnanimous in his literature. He introduced his skilled in the positive aspect of the society besides exploring the vicious view of the society. In Urdu short story, he can be called as the successor of Premchanda and Krisan chandar. *Return ticket* represents him as his representative creation. In this essay, the effort is to establish the view of short story in Urdu literature, Khaja Ahamad Abbas and *Return Ticket*.

ভূমিকা

আধুনিক উর্দু সাহিত্যে খাজা আহমদ আব্বাসের (১৯১৪-১৯৮৭) পরিচিতি একজন কথাশিল্পী হিসেবে। কথাশিল্পীসত্তার পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্রকার, কলামিস্ট, নাট্যকার। তাঁর সাহিত্যকর্মে পরিচ্ছন্ন সমাজচিন্তার ছাপ স্পষ্ট। 'মানুষ'—তাঁর সাহিত্যে মহীয়ান। সমাজের ঘৃণ্য দিক উন্মোচনের পাশাপাশি ইতিবাচক সমাপ্তিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উর্দু ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁকে প্রেমচন্দ ও কৃষণচন্দরের যোগ্য উত্তরসুরি বলা যেতে পারে। *রিটার্ন টিকেট* তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। অন্যকথায় তাঁর ছোটগল্প সত্তার পরিচয়বাহী। উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্প, খাজা আহমদ আব্বাস এবং *রিটার্ন টিকেট*র স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা যেমন কবিতা, উর্দু সাহিত্যে তেমনি মসনভি-গজল-কসিদা। যদিও উর্দু ভাষার স্বতন্ত্র কোনো লিপিরূপ নেই তবুও সাহিত্যবিচারে উর্দুকে ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বাংলা সাহিত্যের মতো উর্দুসাহিত্যও তার শাখা বিস্তার করেছে শের-আফসানা-নভেল-ড্রামা-গজল ও বিবিধ গদ্য রচনায়। ভাষা-পরিচয়ে হিন্দির কাছে উর্দুর ঋণ অপরিহার্য। কেননা 'হিন্দি ভাষা হলো প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দেহলভি (দিল্লির প্রাচীন নাম) খড়ী বুলি ভাষার একটি নবরূপ, যা দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়। আর উর্দু ভাষা হলো ভারতীয় মুসলমান কবিদের সৃষ্ট হিন্দি ভাষার একটি নবরূপ, যা আরবি লিপিতে লেখা হয়।'[১] বাংলা সাহিত্যের মতো উর্দু ছোটগল্পেরও সূচনা উনিশ শতকে। এর বিকাশ ঘটে বিশ শতকে। জীবনের মহাকাব্যিক গদ্যকাহিনী হতে স্পর্শকাতর যন্ত্রণার ঘটনা বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম হয় ছোটগল্পের। ছোট অথচ ছোট নয় এমন ঘটনাই ছোটগল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। গল্পবৃত্তেই

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আমাদের জীবনচর্যা। প্রকৃত অর্থে 'মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই।'[২] অন্যভাবে 'সারা পৃথিবী তখন হিমশীতল শুভ্রতায় আচ্ছন্ন, মানুষের তখন ভালো করে কথা ফোটেনি, লিপি আবিস্কৃত হয়নি, তখন থেকেই মানুষ গল্প শুনছে।'[৩] গল্প বলা আর গল্প শোনা মানুষের স্বভাব। সভ্যসাহিত্যের প্রাচীন আঙ্গিক কবিতা হলেও গল্প মানুষের সহজাত। পরিবেশনগুণেই তা ভিন্ন নামে ভিন্ন মাত্রা পায়। তা হয়ে ওঠে জীবনের খ িত রূপায়ণ। আরও সহজ করে বলা যায় জীবনের পূর্ণাবয়ব নিয়ে উপন্যাস যদি হয় বটগাছসদৃশ তবে ছোটগল্প হবে সুপারিগাছসম । বটগাছ বহুরৈখিক শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করে আর সুপারি গাছ সোজা উঠে গিয়ে ফল দিয়ে তার কাজ শেষ, নির্দিষ্ট বিন্দু তার লক্ষ্য।

উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্পের কিংসূচনা উনিশ শতকের শেষার্ধে মুন্শী সাজ্জাদ হোসেন (১৮৫৬-১৯১৫) সম্পাদিত 'আউধ পঞ্চ' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। এ পত্রিকায় তখন সম্পাদক স্বয়ং, জওয়ালা পরসাদ বর্ক (১৮৬৩-১৯১১), সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ(১৮৬৪-?), মচ্ছু বেগ প্রমুখ হাস্যরসাত্মক যে রচনাগুলো প্রকাশ করেন সেগুলোর ভেতরেই ছোটগল্পের সম্ভাবনার বীজ লক্ষ করা যায়। 'একালে আউধ পঞ্চের প্রয়োজনে ছোটগল্পের যে সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়, পরবর্তীকালেও অন্যান্য সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনে সে সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে এবং ছোটগল্পের বিকাশ ঘটে।'[৪] উর্দু সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার সৈয়দ সাজ্জাদ হায়দার (১৮৮০-১৯৪৩)। মৌলিক রচনা না হলেও তাঁর গল্পগুলো মৌলিকতার দাবিদার। "লায়লা মজনু", "খয়ালিস্তান", "নিকাহ্ এ সানী", "সোহবৎ-এ না-জিন্স", "চিড়ে চিড়ুয়া কি কহানী", তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। অতঃপর হাসান নিজামী (১৮৭৯-?), রাশেদুল খয়রী (১৮৬৮-১৯৩৬),র হাত ধরে বিস্তার লাভ করতে থাকে উর্দু ছোটগল্প—যার প্রতিনিধিত্ব করেন মুন্শী প্রেম চন্দ্ (১৮৮০-১৯৩৬), কৃষণ চন্দর, চুগতাই (১৮৯৫-১৯৪১), শওকত থানবী (১৯০৪-১৯৬৩)ও। এছাড়াও 'স্বাধীনতার আগে থেকে এখন পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পরে যাঁরা অবিরামভাবে গল্প লিখে নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে শওকত সিদ্দিকী, বলবনৎ সিং, আনওয়ার, কাশ্মীরী লাল জাকের, খাজা আহম্মদ আব্বাস, ইনতেজার হোসেন, কুর্রতুল আয়ন্ হায়দর, সাদেক হোসেন, মুমতাজ শীরীন, শাহজাদ আখতার, তস্নীম সলীম ছাতারী, আবুল ফজল সিদ্দিকী, খোদেজা মস্তূর, হাজেরা মসরূর, রামানন্দ সাগর, আখতার আওরেনবী, মসউদ শাহেদ, আজীজ আসারী, এজাজ হোসেন বাটলাবী, গোলাম আব্বাস, দেবেন্দর সৎয়ার্থী, ফিক্র্ তওন্স্বী, মহেন্দর্ নাথ, রাজিয়া সাজ্জাদ জহীর, রিয়াজ রউফী, এ. হামীদ, জীলানী বানু, উম্মে আম্মারা, আজীজ আহমদ, গোলাম মোহাম্মদ প্রমুখের নাম উলেখ করতে হয়।'[৫] উর্দু সাহিত্যে প্রেমচন্দ-কৃষণ চন্দের উত্তরসুরিরূপেই খাজা আহমদ আব্বাসের (১৯১৪-১৯৮৭) পরিচিতি। বিশ শতকী উর্দু সাহিত্যের বিকাশে তৃতীয় চতুর্থ দশকে তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি ব্যপ্তি লাভ করে। উত্তরাধিকারের সূত্রে নয়, আপন মেধাবলে খাজা আহমদ আব্বাস তাঁর কথাসাহিত্যিক সত্তার স্ফূরণ ঘটান। প্রগতিমনস্ক হওয়ায় তাঁর উদারনৈতিক চিন্তার শিল্পিত প্রকাশ ঘটে সাহিত্যকর্মে। তিনি খুব করে লালন করতেন শিল্প ও জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন। একইসাথে তিনি চলচ্চিত্রকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, কলামিস্ট, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। বোম্বের বিখ্যাত `BLITZ' পত্রিকায় 'কে আব্বাস কলাম' শিরোনামে কলাম লিখতেন তিনি। সাধারণ জীবনকথন যখন শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পে রূপায়ণ করেন তাতেই তিনি তুষ্ট নন, শিল্পকে তিনি ভিজ্যুয়ালি দেখতে

এবং দেখাতে দক্ষ। ফলে তার সাহিত্যে মেলে চলচ্চিত্রের স্বাদ আর চলচ্চিত্রে মেলে সাহিত্যের ছাপ। পরিচ্ছন্ন সমাজভাবনা তাঁকে এমন যৌথশিল্পের গাঁথুনি শেখায়।

খাজা আহমদ আব্বাস মধ্য-ভারতের পানিপথে ১৯১৪ সালের ১৪ জুন জন্মগ্রহণ করেন। আলীগড় থেকে স্নাতক ও এল. এল. বি পাশ করে 'বোম্বে ক্রনিকেল' পত্রিকায় সাব-এডিটর পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সূত্রপাত। সাংবাদিকতা জীবন থেকেই সাহিত্যজীবন শুরু। শতাধিক ছোটগল্প আর সাতটি উপন্যাস তাঁর কথাশিল্পী সত্তাকে ত্বরান্বিত করে। লিখেছেন নাটক, নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র। তাঁর গল্পকার সত্তা কিছুটা নির্লিপ্ত হতে পারে একমাত্র চলচ্চিত্রকার সত্তার কাছে। রুশ ও জার্মান ভাষায় অনূদিত *ইনকেলাব* তাঁর আলোচিত উপন্যাস। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ উপন্যাসের ভূমি। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে *বোম্বাই রাতকি বাহোঁ মে*ও বেশ আলোচিত উপন্যাস। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'জামেয়া' নামের একটি উর্দু সাময়িকীতে। গল্পের নাম "আবাবিল"। একজন কৃষকের জীবনের শিল্পিত বয়ান এ গল্প। প্রতিনিধিত্বকারী গল্পগ্রন্থের মধ্যে *জাফরানকে ফুল*, *বিশবি সর্দি কে লায়লা মজনুন*, *এক লাড়কী*, *পাঁউ মে ফুল*, *কাহতে হো জিসকো ইস্ক*, *রিটার্ন টিকেট*, *তিন লাড়কী* উলেখযোগ্য। নাটক ও চলচ্চিত্র তৈরিতে তার দক্ষতা প্রশংসনীয়। *জোবেদা*, *ইয়া অমৃত হায়*, *চত্তধা গলিয়াঁ* ইত্যাদি তাঁর নাটক আর *নয়া সংসার* নামক চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণ করে বোম্বের চলচ্চিত্র অঙ্গনে এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পান তিনি। বাংলার মন্বন্তরের নির্মম অথচ বাস্তব রূপ পরিস্ফূট *ধরতি কে লাল* চলচ্চিত্রটি ইউনেস্কোর প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। *আজ আওর কাল*ও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও *ডাক্তার কিটনিস কি অমর কাহিনী*, *আওয়ারা*, *শ্রী ৪২০*, *মেরা নাম জোকার*, *চারদিন চাররাত*, *গিয়ারা হাজার লাড়কিয়া*, *বোম্বাই রাত কি বাহোমে*, *শেহের আওর সপ্না* ইত্যাদি তাঁর উলেখযোগ্য চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র জীবনে খাজা আহমদ আব্বাসের সবচেয়ে বড় অর্জন সঙ্গীত বিহীন নিরীক্ষাধর্মী ছবি নির্মাণ। ১৯৫৫ সালে *মুন্না* নামের এমন একটি নিরীক্ষাধর্মী ছবির জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই খাজা আহমদ আব্বাস চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এর আগে তিনি রচনা করেছেন উপন্যাস ও গল্প। অর্থাৎ একজন কথাশিল্পী হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্রকার। কিন্তু তাঁর গল্পকার সত্তা ঈর্ষণীয়। প্রেমচন্দ-কৃষণ চন্দর সারির গল্পকার তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ(১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ের ভয়ংকর বাস্তবতা, দুর্ভিক্ষের ভয়াল করুণ চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করতে না করতেই দেশবিভাগের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। সমকালীন রূঢ় বাস্তবতা তাঁকে বিস্মিত করে, যোগান দেয় সাহিত্য রচনার। সমাজ ও সমকালের পাশাপাশি মানবমনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হতাশা, জিঘাংসা বিভিন্ন দিক তাঁকে ভাবিত করে। ফলে তিনি জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পী। তাঁর বিশ্বাস—সমকালের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে জীবন বাঁচার স্বপ্ন দেখে সে জীবনের ছবিই তাঁর হৃদয়ের তাগিদ। তিনি নিজেই বলেন—' জীবনের তাগিদে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি গল্প রচনা করি।'[৬]

রিটার্ন টিকেট খাজা আহমদ আব্বাসের প্রতিনিধিত্বকারী রচনা। ১৯৭৭ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এ গল্পগ্রন্থটির অনুবাদরূপকেই এ প্রবন্ধে বেছে নেয়া হয়েছে। মূলানুগত অথচ বাংলা ভাষায় প্রাঞ্জল অনুবাদটি বাংলাভাষীর জন্য সহায়ক বিবেচনায় জাফর আলমকৃত অনুবাদ এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য। *রিটার্ন টিকেট* গল্পগ্রন্থেই খাজা আহমদ আব্বাসের মানসপরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পকার হিসেবে সফলতার পেছনে রয়েছে তাঁর সমাজসচেতন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি। ছোটগল্পের আদল তাঁর জানা। যেমন—'কোন

একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, জীবনের কোন একটি বিশেষ দিক কিংবা কোন একটি অর্থবহ ইংগিতকে এমনভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুতি না ঘটে এবং প্রতিটি পংতির প্রতিটি শব্দে সে পরিণতির দিকে সবেগে ধাবিত হয়—ছোটগল্পের সম্ভবতঃ এই হলো প্রকৃষ্ট পরিচয়।'[৭] আর এ ছোটগল্প রূপায়ণে সমাজবিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট দরদ দিয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যের গল্প পঠন-পাঠনে তাঁর কমতি নেই মোটেও। কার গল্প পড়ে তিনি অনুপ্রাণিত হলেন গল্প লেখায়? উত্তরে তিনি জানান—'প্রেমচান্দ, চেখব, ও হেনরী ও মোপাঁসার গল্প আমাকে গল্প লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।'[৮]

সাহিত্যের আধুনিকতায় ব্যক্তি হয়ে ওঠে সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্যে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত হয় মানুষ। মানব জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গগুলো যখন সময়ের নিষ্পেষণে নাভিশ্বাস অবস্থা পরিগ্রহ করে তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। সাহিত্যিকেরা এক ধরনের দায় থেকে জীবনের অমৃতকথন তুলে আনেন। জীবনছবিই হয়ে ওঠে তখন সাহিত্য। ছোটগল্প যেহেতু জীবনের বহুরৈখিক উপস্থাপন নয়, একটি মাত্র লক্ষ্যভেদী, সেহেতু সে মাধ্যম কঠিন কিন্তু অনেক বেশি ঘনীভূত। এক অর্থে এক জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার স্পর্শকাতর ছুঁয়ে যাওয়া অংশের নাম ছোটগল্প। 'প্রাচীন উপদেশপূর্ণ পশুপাখির গল্প বা রূপকথার কাহিনীর সহিত কিছুটা সম্পর্ক থাকিলেও আধুনিক যুগে ছোটগল্প বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে সজীব মানুষ-মনেরই চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।'[৯] খাজা আহমদ আব্বাসের গল্প এর থেকে মোটেও ব্যতিক্রম নয়। একজন সত্যিকার সাহিত্যশিল্পীর মনন তাঁর। সমাজমনস্ক চিন্তার সঙ্গে তাঁর বসতি। তিনি বলেন— 'লেখকরা সমাজের দর্পণ স্বরূপ, যেখানে সমাজের আসল রূপ প্রকাশ পায়। লেখক সাহিত্যিকেরা মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং যা কিছু দেখে তাই স্বীয় সৃষ্টির মাঝে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন। লেখক হলো সমাজ সংস্কারক। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা ও সঠিক পথের সন্ধান দানের প্রচেষ্টা চালান একজন লেখক বা সাহিত্যিক।'[১০] ভারত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছোটগল্পের ভূমি উর্বর হতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়ে প্রতিভাত হয় জনজীবনে। সে জীবন ছেঁকে বাস্তব সমস্যাঅন্বেষী শিল্পমাধ্যম ছোটগল্প। দ্বিধাহীন সত্য যে '১৯৪৭ সালের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উর্দু ছোটগল্পে মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যা প্রাধান্য পায়।'[১১]

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খাজা আহমদ আব্বাসের বিশেষ দিক। সমাজে প্রচলিত নেতিবাচক ঘটনার নেপথ্যে ইতিবাচক যোগসূত্র অন্বেষণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঈজীর মেয়ে, চোর, ভিখারিনী ইত্যাদি চরিত্র সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পায় তাঁর গল্পের ম্যাসেজে। অসংগতির পরিণামে সংগতির সন্ধান করেন। এ বিবেচনায় তাঁকে প্রচ্ছন্ন আত্মবিশ্বাসী-আশাবাদী-কমিটেড লেখক মনে হয়। গল্পে চমৎকার এক আবহ তৈরি করেন যাতে করে বিশেষ চরিত্রগুলোর প্রতি পাঠক নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হয় আর গল্পের পরিণতিতে নাটকীয় মোড় নিয়ে পাঠকের পূর্বধারণার অবসান ঘটে। একটি নতুন পথের সন্ধান মেলে। তখন পূর্বভাবনার ঐ ঘৃণ্যচরিত্রের প্রতিই সহানুভূতি জেগে ওঠে পাঠকের। খাজা আহমদ আব্বাসের স্বাতন্ত্র্য ঠিক এখানেই।

রিটার্ন টিকেট

"রিটার্ন টিকেট" এ গল্পগ্রন্থের নাম গল্প । একজন ব্রজেন্দ্রকুমার সিং এ গল্পের মূল চরিত্র। গল্পের কথক খাজা আহমদ আব্বাস নিজেই। গল্প শুরু হয়েছে ২৫ বছর পরের দৃশ্যে। নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ফোনের ভীড়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ফোন এবং তা ২৫ বছর আগেকার বন্ধু ব্রজোর। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ গল্পে এতদিন পর ব্রজোর সন্ধান পেয়ে বাসায় ডাকে খাজা আব্বাস। লক্ষ্মী ভাবীকে সঙ্গে আনতে বলে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, অসাধারণ বিতার্কিক, টেনিস চ্যাম্পিয়ন ব্রজোকুমার সৌন্দর্যে ক্যাম্পাসের হিরো। এ ব্রজোর জন্যে ক্যাম্পাসের মেয়েরা পাগলপ্রায়। এমন কেউ নেই যে ব্রজোর প্রেমে পড়ার চেষ্টা করে নি। আশা স্যাক্সিনা, অরুণা, সুরাইয়া, সরলা, মোহনা, সিলভিয়া আরও কত! খাজা আব্বাসের সঙ্গে ব্রজোর পরিচয় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারত বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। 'সামাজিক বিপ্লব ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন' বিষয়ে বিতর্ক করতে আসা ব্রজোর অবস্থান ছিলো বিরোধী দলে। বিতর্কে পক্ষ দলকে হারিয়ে ব্রজো বিজয়ী হয়। রানার আপ হয় খাজা আব্বাস। এখান থেকেই ওদের পরিচয়সূত্র অতঃপর নাম ধরে ডাকা বন্ধুত্ব। বিতর্কের খাতিরে বিতর্ক নাকি সত্যি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে ব্রজেন্দ্র ? এমন প্রশ্ন পরবর্তী ঘটনার জন্য জরুরি হয়ে ওঠে। উত্তরে ব্রজেন্দ্র বলে—

> মনে কর ভারত স্বাধীন হয়ে গেল এবং আমার তোমার মন থেকে ধর্মীয় গোত্রগত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ঘৃণা দূরীভূত না হলে চিন্তা করতে পার কি অবস্থা হবে দেশের। কয়জন শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান আছে যারা ধর্মীয়, গোত্রগত এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত?[১২]

সত্যিই কি ব্রজো সাম্প্রদায়িকতার জীবাণুমুক্ত? সে কি কখনো পারবে বাঈজীর মেয়েকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে। অবলীলায় ব্রজো সম্মতির কথা জানিয়ে দেয়। স্পষ্ট হয় ব্রজোমানস। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধ্বজাধারী নয় বরং ঝাণ্ডাধারী ব্রজো। বারানসীতে একদিন লক্ষ্মী বাঈজীর নাচ দেখতে গিয়ে ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে। নাচ-গান শেষে লক্ষ্মী বাঈজী হাত চেপে ধরে ব্রজোর। ব্রজোকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। খাজা আব্বাস জানায়—'ওই মাংসে বিষ মাখানো আছে।' কিন্তু ব্রজোর ব্যতিক্রমী উত্তর—'কারো মনে আঘাত দেয়ার চেয়ে বিষ পান করাই শ্রেয়।' একসময় আব্বাস জানতে পারে ব্রজো লক্ষ্মীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভালোবাসার মূল্য দিতেই সে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ সিদ্ধান্তেও সে স্থির হয়েছে যে—পরদিন বাড়ি যাবে বাবা-মাকে তার সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য। শ্যামনগরের বাড়ি যাবার জন্য ট্রেনের টিকেট করতে গেলে টিকেটক্লার্ক জিজ্ঞেস করে সিঙ্গেল টিকেট নাকি রিটার্ন টিকেট? যেহেতু ফিরবেই সেহেতু রিটার্ন টিকেটই করে ব্রজো। এরপর আর দীর্ঘদিন পারস্পরিক খোঁজখবর নেই। ২৫ বছর পর আজ ব্রজোকে পেয়ে খাজা আব্বাস খুব আগ্রহ ভরে ভাবীর কথা জানতে চাইলে ব্রজো বিচ্ছেদের কাহিনী শোনায়। জানায়—বিয়ের পর বৌ নিয়ে মা-বাবার সঙ্গেই ছিলো সে। সেখান থেকে আই.সি.এস পরীক্ষায় পাশ করে । এরপর চাকরি পেয়ে সীমান্ত প্রদেশ, আসাম, কোরাগে নানা জায়গায়। এরই মধ্যে জন্ম নেয় প্রথম সন্তান । কিন্তু ব্রজো জানায় ছেলেটি ব্রজোর ঔরসজাত নয়; চাপরাশির। অতঃপর মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে মেন্টাল হসপিটালে তিন মাস। চাকুরি ছেড়ে দেয়। ইংল্যান্ডে চলে যায়। পেনশনের টাকা বিক্রি করে একটি বাড়ি কেনে। এক অংশে ব্রজোর পরিবার আর অন্য অংশে ভারতীয় ও আফ্রিকান ছাত্রদের ভাড়া। এখানেও পুরনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। ভাড়াটে ছাত্রদের

সঙ্গেও দৈহিক সম্পর্কে জড়ায় ব্রজোর স্ত্রী। ১০ বছরে জন্ম নেয় আরও তিনটি সন্তান—একটি নিগ্রোদের মতো, একটি শ্যামলা আর একটি ফর্সা। এমন কথায় বিস্মিত হয় খাজা আব্বাস—'আমি ছাব্বিশ বছর আগেই বলেছিলাম যে পতিতার মেয়ের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কিছু আশা করতে পার না।' না তেমনটি নয়। আব্বাস যা ভাবছে তেমনটিতো নয়। পিতা-মাতার আদেশ, সম্পত্তি বঞ্চিতের হুমকি, লক্ষ্ণৌ যেতে না দেয়া সবকিছু মিলিয়ে ব্রজো বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে জমিদার কন্যা মোহনাকে। তাহলে লক্ষ্মী? 'ব্রজো পকেট থেকে ছোট্ট ডিব্বা বের করে সেখান থেকে একটি পুরানো টিকেটের টুকরা বের করে। সেটাই ২৪ বছর আগেকার রিটার্ন টিকেট যা ব্রজো সযত্নে রেখে দিয়েছে।' শেষ পর্যন্ত মোহনাকে লন্ডনের বাড়ি উৎসর্গ করায় তালাক দিতে রাজী হয়েছে মোহনা। নারীরা এমন হয়? হতে পারে? কেন হয়? ব্রজোর মতে মোহনা দোষী নয়। এ পরিস্থিতির জন্য সে নিজেই দায়ি। ভুলতে পারে নি লক্ষ্মীকে। মাঝে-মধ্যে তাই ভুলে থাকার ইচ্ছায় ডুবে যায় মদের ভেতর। বিয়ের পর একদিন মদের মাত্রা বেশি হওয়ায় ঘরে ফিরে মোহনাকে আদর করতে করতে হঠাৎ-ই লক্ষ্মী মনে হয়েছে তার। মোহনাকে লক্ষ্মী ভেবে বলে—'তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না লক্ষ্মী'। এরপর থেকে মোহনাও মদ খেতে শুরু করে এবং জন্ম নেয় আজকের পরিস্থিতি। আর ওদিকে লক্ষ্মী? 'এখন নাকি সে গুরুতররূপে অসুস্থ। হয়তো কোনো মন্দিরের সিঁড়িতে পড়ে মৃত্যুর দিন গুনছে।'—সমাজের চোখে ঘৃণ্য বাঈজীগোষ্ঠীকে সামাজিক মর্যাদায় স্থান করে দেয়ার একটা প্রচেষ্টা এ গল্পে লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু সমাজসত্য সবসময় শিল্পিত সত্য হয়ে ধরা দেয় না। ফলে লক্ষ্মী থেকে যায় দূরের বাসিন্দা কিন্তু তাদের ভেতরকার কষ্টধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের শেষাবধি লক্ষ্মীর কাছেই প্রত্যাবর্তন এবং সিঙ্গেল টিকেটে, রিটার্ন টিকেটে নয়। ঠিক এ বিন্দুতেই কাহিনীটি গল্পের মর্যাদা পায়। শ্রেণীবৈষম্য দূর প্রচেষ্টার এক অনুপম গল্প এ "রিটার্ন টিকেট" আমাদের শুভচেতনায় কড়া নাড়ে।

চড়ুই পাখী

দ্বিতীয় গল্প "চড়ুই পাখী"। মানুষের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকলেই তাকে মানুষ বলা যায় না, তার জন্য চাই মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতিপ্রবণ আবেগ-অনুভূতি-উপলব্ধি। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র বিবেকবান, মানবিক। সে শক্তিতেই সে আশরাফুল মাখলুকাত। কিন্তু সমাজে মনুষ্যত্বহীনের অভাব নেই। রহিম খান তেমনই এক চরিত্র। অসামাজিক, আনকালচারড, অমানবিক, অত্যাচারী, জনবিচ্ছিন্ন। জালিমেরও চূড়ান্ত পর্যায়। সন্তান সন্ততি-স্ত্রী তার কাছে সবসময় নির্যাতিত সীমাতীত। গ্রামসুদ্ধ মানুষজন তার আচরণের জন্য তার সাথে কথা বলে না। এমনকি তার হাত থেকে হালের বলদ দুটোও রেহাই পায় না। পিটুনির ক্ষত বলদের গায়ে দগদগ করে। গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা দুষ্টুমি করে রক্ষা পায় না। ঘরের কথা তো বলাই বাহুল্য—

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বউ আর ছেলে দুটোকে নিয়ে রহিম খিস্তি শুরু করবে। শাক সবজি বা ভাজাভুজিতে বউ লবণ দিতে ভুলে গেছে তো আর রক্ষা নেই। কোন ছেলে কোন অপকর্ম করলে তো তাকে পা উপরে করে বেঁধে গরু পেটা লাঠিটা দিয়ে পিটাতে থাকবে। বেহুস না হওয়া পর্যন্ত ছেলের নিস্তার নেই। হররোজ এমনি একটা না একটা কিছু ঘটবেই ঐ বাড়িতে। প্রায় প্রতি রাত্রেই বউ-বাচ্চাদের উপর গাল-খিস্তি মার-ধোর ...যন্ত্রণায় ওরা চীৎকার করতে থাকে। পাড়া-পড়শীরা দেখে-শুনে কেউ আসে না। এগিয়ে এসে যে রহিমকে থামাবে সে সাহস কারুর হয়ে ওঠে না।[১৩]

বাবার অত্যাচারে পরপর দুটো ছেলেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে ; ফেরে নি পর্যন্ত। অসহ্য নির্যাতন সইতে না পেরে বউও একদিন বাবার বাড়ি চলে যায়। নিঃসঙ্গ হয়ে যায় রহিম খান। তবুও তার তেজ কমে না। ঘরের বেড়ালটাও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। কিন্তু এ রক্তমাংসের মানুষটির কি কোন পরিবর্তন আসবে না। উপলব্ধিতে কি কোনোদিনই জাগবে না মায়া-মমতা? ফিরবে। মানুষ ফেরে কোনো একসময়। রহিম খানও ফেরে। একদিন ঘরের সিলিংয়ের কাছে চড়ুই পাখীর বাসা তার চোখে পড়ে। প্রথম প্রথম এ বাসা ভাঙারও পরিকল্পনা করে সে। কিন্তু রহিম খান দেখতে পায়—

হৃষ্টপুষ্ট দুটো বাচ্চা ভিতরে কিচিরমিচির করছে আর তাদের বাপ-মা মাথার উপর উড়ে উড়ে তাদেরকে সম্ভাব্য আপদ-বালাই থেকে রক্ষা করছে। বাসার দিকে হাত যাবে কি, মাদী চড়ুই তার মাথায় ঝাপটা মারল।...বাসা ভাঙা হল না আর।[১৪]

হয়তো এ দৃশ্যই রহিম খানকে সম্বিৎ ফিরে পেতে সহায়তা করে। বাবা-মা আর সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র তাকে ভাবায়। ভিতরে ভিতরে ক্ষরণ হয় তার। এখন সে চড়ুই পাখীর যত্ন নেয়, খাবার ব্যবস্থা করে, ছেলের নামে ডাকে চড়ুইয়ের বাচ্চা দুটোকে। নুরু আর বুন্দু। নিয়মিত টুকরো রুটি খাওয়াতে গেলে বাচ্চা দুটো বাইরে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ একদিন প্রতিদিনের মতো ডাক শুনেও বাইরে এলোনা নুরু-বুন্দু। রহিম খান বাসার দিকে উঁকি দেয়। 'দেখে চারটি চড়ুই-ই ডানায় মাথা গুজে জড়াজড়ি করে বসে আছে। সিলিংয়ের এক ছিদ্র দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি বাসাটা ভিজিয়ে ফেলেছে।' এরপর আর স্থির থাকতে পারে না রহিম খান। নিজে বৃষ্টিতে ভিজে চড়ুই পাখীর নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে। কি অসম্ভব প্রেম। আগের মতো বদমেজাজী নেই রহিম খান। প্রচণ্ড জ্বরে তার গা পুড়ে যায়। অসুস্থ অবস্থায় সে নুরু-বুন্দু বলে ডাকতে থাকে। আত্মযন্ত্রণার চেয়েও তার বড় চিন্তা ওদের আজ কে খাবার দেবে ? এবং এ মায়াময় ভাবনার সাথেই রহিম খানও পরপারে পাড়ি জমান। রহিম খানের পরবর্তন আর বাড়ি থেকে না বেরুনো ভাবিয়ে তোলে গ্রামবাসীকে। তার চিরন্তন যাত্রায় করুণার জন্ম নেয় সবার মনে।—গল্পটিতে মানুষের শোধরানোর রাস্তা বিনির্মাণের পাশাপাশি কর্তব্যবোধের, বাৎসল্যপ্রেমের স্বরূপ উদঘাটনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন গল্পকার। শেষাংশ প্রতীকী হওয়ায় গল্প আরও ভিন্ন মাত্রা পায়।

অনুপমা

আধুনিক বিশ্ব—সুন্দরের স্তূতিতে ব্যস্ত। আয়োজন করে প্রতিযোগিতার মাপকাঠি দিয়ে প্রতিবছর নির্বাচনও করা হয় বিশ্বসুন্দরী। ৩৮-২৪-৩৮ মাপের দেহের গড়ন অথবা সোনালি-বাদামি গায়ের রং আর সহায়ক অনুষঙ্গ মিলে প্রতিবছর এ আয়োজন বসে। কে হবে এবারের সুন্দরী? বিচার, ভোটাভুটি সবই চলে। আমাদের কিংবন্তীতুল্য সুন্দরীদের কথাতো সবার জানা—মিশরের ক্লিওপেট্রা, ইরানের শিরি, আরবের লায়লা, ভারতের পদ্মিনী, ফ্রান্সের জোসেফাইন, ইতালিতে দান্তের বিয়াত্রিচ, ইংল্যান্ডের লেডি গরিভা আরও কতজন। ট্রেনযাত্রায় একই কামরায় মুখোমুখি বসে থাকা সুন্দরী নারীটি কি এদেরই একজন? কি অসম্ভব সৌন্দর্যের অধিকারী! যেন মনে হয় পৃথিবীর সেরা সুন্দরীদের একজন। সাথে যে ভদ্রলোক রয়েছে নিশ্চয় এই সুন্দরীর সৌভাগ্যবান বর। সৌন্দর্য, পারস্পরিক প্রেম, স্ত্রীর প্রিয় খাবার দহিবড়া খোঁজা, ট্রেন ছেড়ে দিলে বর উঠতে পারলো কি না এ নিয়ে সুন্দরীর টেনশন, সব মিলিয়ে মনে হয় এরা হানিমুনে যাচ্ছে। কিন্তু না। বিয়ের তাদের ছ'বছর এবং একটি সন্তানও রয়েছে। তবুও কি

অসম্ভব সৌন্দর্য? বিমোহিত হবার সৌন্দর্য। অপ্রত্যাশিতভাবে এ সুন্দরী নেমে গেলে তাকে খোঁজার জন্য ইজ্জতপুর স্টেশনে নামলে সৌন্দর্যের আর এক প্রতিমূর্তি চোখে পড়ে। ছাপিয়ে যায় ঐ বিশ্বসুন্দরীর রূপও। বিস্মিত করে আলো করা কালো দেহ নিয়ে শিশুকে স্তন্যপানরত রেলসড়ক মেরামত করা এক শ্রমজীবী নারী। মুক্তোর মতো দাত, শ্রমের ক্লান্তির সৌন্দর্য তাকে অবিশ্বাস্য সুন্দর করে তুলেছে। প্ল-াটফরমে সবার সামনে কী এক পরিতৃপ্তিতে সন্তানকে খাওয়াচ্ছে সে—

সবার মাঝখানে সেই কালো মেয়েটি তার শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে আর দুচোখ ভরা অনুরাগ নিয়ে চেয়ে রয়েছে তার পুরুষটির অনাবৃত কালো বলিষ্ঠ দেহটার দিকে। ঠোঁটগুলো তার অল্প একটু ফাঁক আর ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মুক্তোর মতো দুপাটি দাঁত। তার সেই ভালোবাসায় উজ্জ্বল মুখশ্রী আর পরিশ্রমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেহের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো এমন রূপ আমি আর কোথাও দেখিনি–কারো ড্রয়িং রুমে নয়, কোন ফিল্ম স্টুডিও কিংবা ক্লাব–লাউঞ্জেও নয়।[১৫]

এই যেন পৃথিবীর সুন্দর নর-নারী। শ্রমে আর প্রেমে ওদের সম্পর্ক অগাধ বিশ্বাসের; পারস্পরিক প্রেম গভীরতর। কি আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যটিরও জন্ম হয় এদের কাছেই। ট্রেন ছেড়ে দিলে দেখা যায় 'যুবকটি শিশুটিকে শূন্যে তুলে ধরছে আর খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে শিশুটি। ওর মা বুক ভরা গর্ব আর প্রেম ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে ওদের দুজনের দিকে।'—অনুপম এ দৃশ্য আর অনুপমা এ শ্রমজীবী নারীর কাছে বিশ্বসুন্দরী স্টেলাও মূল্যহীন। কেননা এই হচ্ছে পৃথিবীর চিরন্তন সৌন্দর্য আর প্রকৃত সুন্দর। "অনুপমা" গল্পে তুলনামূলক এ বাস্তবতার শিল্পিত উপস্থাপন আমাদেরকে বিস্মিত করে বৈকি। খাজা আব্বাস এভাবেই আমাদেরকে গল্পের ভেতরের গল্পে ভ্রমণের প্রশস্ত পথনির্মাণ করেন। নেগেটিভ চালচিত্র পজেটিভ ভাবনার সৃষ্টি করে। শ্রমজীবী মানুষের সৌন্দর্য অবলোকন এবং তা প্রেম ও মায়াময় করে এমন উপস্থাপন উর্দু সাহিত্যে প্রেমচন্দ ও কৃষণ চন্দর ছাড়া মেলা ভার। স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি বোধ করি এমন গল্পাঙ্গিকের সহায়ক।

দুই হাত

সখারাম চোর। চুরির দায়ে কয়েকবার জেলও খেটেছে সে। এখন সে বোম্বে শহরে অবাঞ্ছিত। চলে আসে পুনায়। 'দুই বিঘা জমি, এক জোড়া গরু, একটি হাল, একটি কুঁড়েঘর আর স্ত্রী সাবিত্রী এই হল সখারামের স্বপ্ন।' চারশো টাকা জমলে বাড়ি ফিরবে সে। সাবিত্রী যেমনটি সুন্দরী ঠিক তেমনটিই পতিপ্রাণা। আজকের যে দৈন্য তা একদিন সরে যাবেই—এ গভীর বিশ্বাস সাবিত্রীর। 'ভাবনার কি আছে। আমার স্বামীর মেহনত করার দুই হাত সুস্থ থাকুক। সব ঝামেলা চুকে যাবে।' একসময় সখারাম লাঙল চষেছে, নালা কেটেছে, বীজ বুনেছে, পানি সেচনও করেছে। তবুও ঋণের বোঝা বেড়েছে। শহরে অহঃরহই কাজ জোটে এ ভাবনায় সখারাম বোম্বে চলে আসে। সহজে কাজ জোটে না। একসময় কালোবাজারী এক মহাজনের গুদামে মাল উঠা নামা করে সে। মজুরি অবশ্য দ্বিগুণ। তিনশ' টাকা জমেছে তার। স্বপ্ন দেখে গ্রামে ফেরার। স্বপ্ন চুরি হয়ে যায়। এক সকালে সে দেখতে পায় তার সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। নেশাখোর ভিকু এ কাজ করেছে। মদের আড্ডায় খুঁজে ফেরে সখারাম। চতুর্থ দিন পেয়েও যায়। সখা ভিকুর গলা চিপে ধরলে সে পকেট থেকে বের করে সাড়ে তিনশ'র স্থলে মাত্র তিন টাকা আশি পয়সা। লাঞ্ছিত হয় সখা, একসময় ভিকুর প্রস্তাবে রাগে সেও মদপান করে। ভিকুর কাছ থেকেই সে চুরি শেখে। চৌর্যবৃত্তি হয়ে ওঠে তার পেশা। আজও চুরি করবে সখারাম। ভোর রাতের জন্য অপেক্ষা করে

সে। আজ ভোরে ভূমিকম্প হওয়ায় সখারাম মনে করে এই দুর্যোগের মুহূর্ত তার চুরি করার মোক্ষম সময়। এগিয়ে যায় সে। চুরির মোহনেশায়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া দোকানগুলো থেকে সখা শাড়ি, রেডিও, জুয়েলারি জমা করে। একটা টাকার বাক্সও। এগুলো নিয়ে তাকে ভোরের আগেই গ্রামে ফিরতে হবে। হঠাৎ-ই একটা শিশুকান্না থমকিয়ে দেয় সখারামকে। প্রথমবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। শিশুটি আরও জোরে কাঁদতে থাকে। সখারামের—

মনে হোল, তারই নিজের শিশু কাঁদছে দীর্ঘদিন সে যার স্বপ্ন দেখে আসছে। মাথায় কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রের পুঁটলী নিয়ে শিশুটির কাছে ফিরে আসে। বোঝার সাথে শিশুটিও সে তুলে নিতে চায়। কিন্তু হাত তার মাত্র দুটি। পুঁটলী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শিশুটির কাছে হাজির হয়। শিশুর পিতামাতার মাথায় একটি বিরাট পাথর চাপা পড়েছে। অনেক আগেই লোকটি মারা গেছে। মহিলার পায়ে হাত দিয়ে দেখে সব শীতল হয়ে গেছে। দু'হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। কোলে নিতেই শিশুটির কান্না থেমে যায়।...তারপর শিশুটিকে দুই হাতে বুকে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে।[১৬]

"দুই হাত" গল্পে গল্পকার এভাবেই একটি অসুস্থ জীবন থেকে সুস্থ জীবনে ফেরার পথ নির্দেশ করেন। বোধ করি মানুষ নষ্ট হলে আর ফেরার পথ থাকে না এ কথা অন্তত খাজা আব্বাস বিশ্বাস করেন না। নৈতিকতার বোধে তিনি কড়া নাড়েন। পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াময় সম্পর্ক, প্রত্যাশিত আগামী নিশ্চয় কোলজুড়ে আসা প্রজন্ম। এদের নিষ্পাপ কান্নাই পারে সুস্থ জীবনের সুনিশ্চিত ঠিকানার সন্ধান দিতে। "দুই হাত" গল্পের দু'হাতের পরিবর্তিত কর্ম অন্তত সে সত্যেরই সন্ধান দিতে সক্ষম।

চকলেট

একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুধীর চৌধুরীর ট্র্যাজিক জীবনছবি প্রতিফলিত "চকলেট" গল্পে। জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির চিত্রপ্রদর্শনীতে দর্শকের উপচে পড়া ভীড়। আলোচিত চিত্রকর্ম 'প্রসাধন' আর 'মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি'। শিল্পীর জীবনকাব্য রঙতুলিতে পেয়েছে শিল্পরূপ। শিল্পের দাবি মিটিয়ে তা একেকজনের কাছে ধরা দিয়েছে একেক অর্থে। 'প্রসাধন' নামক চিত্রকর্মটি বিক্রির জন্যে নয়। ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রের প্রভাবে নির্মিত ছবিটি। মূলত সুধীর চৌধুরীর প্রেয়সী মীনাক্ষী দেবীর। সুধীর যখন আর্ট স্কুলের ছাত্র তখন টিউশনি করে লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হতো তাকে। উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে মীনাক্ষীকে সে ড্রয়িং শেখায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুরু হলে সুধীর পড়াতে যায় আর ঘণ্টাধ্বনি শেষ হলে পড়ানোও শেষ হয়। পড়াতে গিয়ে ড্রয়িং দেখতে চাইলে মীনাক্ষী বায়না ধরে চকলেটের। এমন করেই চলতে থাকে। সুধীরের বুকের কোণে জমাট বাধে প্রেম। টানা দশরাত জেগে সে মীনাক্ষীর ছবি আঁকে। সিদ্ধান্ত নেয় আজ মীনাক্ষীকে সব খুলে বলবে। কিন্তু হায়! মানুষ যা চায় তা কি সে পায়? সিঁড়ির কাছেই মীনাক্ষীর বাবার সাথে দেখা। মীনাক্ষীর বাবা-মা উভয়ের কাছ থেকে জানতে পারে মীনাক্ষীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি আর চকলেট চাওয়া বারবার কানে বাজে সুধীরের। কিন্তু কিছুই করার নেই তার। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে সে দিলিতে আসে, পত্রিকায় মীনাক্ষীর বিয়ের খবর পড়ে। তখন—

ইউরোপে মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের পর ভারত স্বাধীন হয়েছে। বৃত্তি নিয়ে সুধীর প্যারিস চলে গেছে। সেখানেও মন্দিরের ঘণ্টা তার পিছু ছাড়েনি।[১৭]

ভারতে ফেরে সুধীর। এক নৈশভোজে আমন্ত্রিত হলে মি. আর মিসেস লক্ষ্মীকান্তর নাম অতিথি তালিকায় থাকায় অসুস্থতার ভান করে সে অনুষ্ঠানে যোগ দেয় নি সুধীর। এরই মধ্যে জীবনে এসেছে মেরী মার্সান, সাংবাদিক লুসী। কারো সাথেই ঘর হয় নি সুধীরের। বার্লিন, রোম, প্যারিস, আমেরিকা হয়ে সুধীর এখন লন্ডনে। পত্রিকায় লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যু সংবাদ পড়ে। বোম্বে ফিরে আসে সুধীর। একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সুধীজনের সঙ্গে মীনাক্ষী লক্ষ্মীকেও আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। সন্ধ্যা অবধি মীনাক্ষী আসে নি। গ্যালারি বন্ধ করার সময় দারোয়ান জানায় একজন ভদ্রমহিলা এসেছে। ভিজিটিং কার্ড দেখে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় সুধীরের। বিগত যৌবনা এক বয়স্ক মহিলা প্রবেশ করে। চুলে কলপ, ঠোঁটে পাইপ সিগারেট। 'প্রসাধন' ছবিটার নিকট এসে থমকে দাঁড়ায়। বলে, ছবিটি সুন্দর তবে শীর্ণকায় এবং কেমন যেন চেনা। সুধীর জানায়—না না বাস্তবের সাথে এর মিল নেই, এ—তো কল্পনার ছবি। মীনাক্ষী চলে যাবার সময় একটা চকলেট নিজের মুখে পুরে দেয় আর সুধীরকেও একটা খেতে আহ্বান জানায়। সুধীর নাসূচক ধন্যবাদ দেয়। 'তাইতো এত শীর্ণকায়' বলে হেসে চলে যায় মীনাক্ষী। ছবিটার উপরে পড়া বাতি নেভাতে চায় দারোয়ান কিন্তু বাধা দেয় সুধীর। এই বাতিটাও যদি নিভে যায় তাহলে ওর জীবনে আর অবশিষ্ট থাকে কী? কষ্টের মর্মমূলে লালন করা ছবি বিক্রির জন্য নয়। শিল্পীর জীবনের ট্র্যাজিডিচিহ্ন এ ছবি যে ছবি কিনা সপ্রশংসার। শিল্পীর স্বপ্ন যদি কষ্টপ্রসূত হয় আর তা যদি প্রতিফলিত হয় চিত্রশিল্পে তবে তা কালজয়ী হয়। শিল্পীও নিজেকে খুঁজে পায় তাঁর কর্মের মধ্যে। চকলেট এ গল্পে সহায়ক মাত্র।

হাতের দাগ

"হাতের দাগ" গল্প আমাদের আশেপাশে সবসময় ভীড় করা এক বাস্তবতায় শুরু হলেও যে বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের অহঃরহ পরিচয় ঘটে না—সে বাস্তবতার চিত্র পরিস্ফূট। বিশ-বাইশ বছর বয়সের এক ভিখারিনীকে ঘিরে এ গল্পের বলয়। বাবার ঔষধ কেনার জন্য ভিক্ষায় নেমেছে সে। মনে হয় এ তার ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল। আবার অন্যভাবনাও ভীড় করে। ভিখারিনী নানা জায়গায় দেড়টাকা ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে এক দালালের কাছে গেলে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। পোস্ট অফিসের পেছনের এক হোটেলে দালালের সঙ্গে যায় সে। আধ ঘণ্টা পর বেরোয়। হাতে তার পাঁচ টাকা। এ নাটকের শেষ দৃশ্য দেখার জন্যে তার পিছু নেওয়া। ওডলো স্টেশনের রেলপট্টির কাছে একটা কুড়েঘরে ভিগো ভিগো বলে ডাকতে থাকে মেয়েটি। এখান থেকে সে মদ কেনে। তার মানে মেয়েটি মদ পর্যন্ত খায়? এমন ধারণা ঘনীভূত হতে থাকে। ভাঙা একটি কুড়েঘরের কাছে গিয়ে হঠাৎ ফিরে তাকায় মেয়েটি। দেখতে পায় একটি লোক— এতক্ষণ ধরে তাকে ফলো করছে যার কাছে প্রথম দেড় টাকা ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিল সে। কেন ফলো করছে জানতে চাইলে লোকটি জানতে চায় কোন ডাক্তার তাকে এ বোতল কিনতে বলেছে? মেয়েটি জানায় বাবা অসুস্থ। এই ঔষধ পেটে না পড়লে যন্ত্রণায় ছটফট করে। বিশ্বাস করে না লোকটি। তোমার বাবা বলতে কেউ আসলে নেই—এমন কথা বলায় মেয়েটি আহ্বান জানায় কুড়েঘরে। তাও কৌশল মনে হয়। একসময় কান্নার আওয়াজে কাছে গিয়ে দেখে—

ঘরের একটি খাটিয়ায় অস্থিচর্মসার একটি মনুষ্যমূর্তি পড়েছিল। চোখ দুটি উন্মুক্ত, যেন কারো প্রতীক্ষায় ছিল। এক হাত পেটে রাখা ছিল , হয়তো ব্যথা চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে, আর এক হাত প্রসারিত। হাতের আঙ্গুলগুলি কয়েকটি বোতলের দিকে ইঙ্গিত করছিল।[১৮]

করুণাবশত কিছু টাকা দেবার চেষ্টা করে লোকটি। কিন্তু মেয়েটি তা নেয় না। বাসায় ফিরে লোকটি দেখতে পায় তার হাতের মুঠোয় দেড় টাকা এবং তালুতে একটি দাগ। ডাক্তার জানায় হয়তো নতুন ধরনের কোন কুষ্ঠ রোগ হবে। জীবনের এক অন্ধগলি চেনা হয় এ গল্পে। আমাদের নিত্যদেখা সব সত্য, সত্য নয় তা প্রমাণ হয়ে যায়। সবকিছুর মধ্যে একটা সঙ্গতির সন্ধান মেলে। সমস্ত ভ ামির পরও হয়তো কোনো সত্যের পুণ্যে পৃথিবী টিকে আছে; থাকবে। এমন সত্যেরই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় "হাতের দাগ" গল্পে।

এক মগ চাল

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ, চোরাকারবারী-মজুতদারীদের ঘৃণ্য কৌশল জন্ম দিয়েছে দুর্ভিক্ষের। এক মগ চালের প্রত্যাশ্যায় তাই মেয়েদের লাইনে দাঁড়িয়েছে অন্তঃসত্ত্বা দুর্গা। কৃত্রিম সংকটে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হিদুস্তানী জনগণ। কেউ দোষ দেয় গান্ধীর আর কেউ বা কংগ্রেসের। আবার কেউবা সরকারের। সুযোগ বুঝে চোরাকারবারী, মজুতদারী ব্যবসায়ীরাই কৃত্রিম এ সংকট তৈরি করে। ফলে রেশনের চালের জন্য লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়ে। বিশ্বযুদ্ধের দামামা। অসুস্থ দুর্গা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না চালের লাইনে। নানাজনের নানা কথা আর অসহ্য কষ্টে তার কখনো কখনো মনে হয় চাল নেবে না কিন্তু খাবে কি এই ভয়ে সে সরতেও পারে না। চাল নেবার শেষ ধাপে সিঁড়ি উঠতে পারে না দুর্গা। মাথা ঘুরতে থাকে; ঘুরতে থাকে সবকিছু। এখানেই সন্তান প্রসব করে দুর্গা। লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। একসময় লজ্জার মাথা খেয়ে বিজয়িনীর বেশে উঠে দাঁড়ায় দুর্গা । এক হাতে ছেলে কোলে আর এক হাতে এক মগ চাল। জঠর দহন নিবারণের এমনই এক গল্প "এক মগ চাল"। গল্পে মন্বন্তর চিত্রের সমান্তরালে জঠরজ্বালার কাছে লজ্জাও যে হার মেনে যায় তা প্রমাণিত হয়। অমানবিক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করেও যে মানুষ বাঁচতে চায়; আগামীর জন্ম দেয়। "এক মগ চাল" সে ইঙ্গিত বহন করে।

উপসংহার

রিটার্ন টিকেট—এর প্রতিটি গল্পেই প্রতিষ্ঠা পায় শুভ পরিণতি; সঙ্গতির ইঙ্গিত। পাঠকের সুকুমারবৃত্তির দ্বারে আঘাত করে। মানুষকে মানবিক ভাবনায় জারিত করতে সহায়তা করে। একজন মহৎ শিল্পী বলেই তিনি তা পারেন। 'জীবনঘনিষ্ঠ এ মহৎ শিল্পী শিল্পের সুশোভন মোড়কে জীবনের জটিল প্রশ্নাবলী তুলে ধরার যে টেকনিক রপ্ত করেছেন, খোদ উর্দু সাহিত্যেও তাঁর তুলনা মেলা ভার।'[১৯] সত্যিই তাই। সময় ও সমাজের বাস্তবচিত্র তার শিল্পকথায় অনুপম হয়ে ওঠে। ভারত স্বাধীনতার পর তার মতো একজন শিল্পীর প্রয়োজন ছিল জরুরি। কেননা 'বর্তমান যুগের মানসিক টানাপোড়েন এবং উন্নয়নকামী দেশের আর্থিক অসচ্ছলতা—অন্যান্যের মতো উর্দু সাহিত্যিকরাও এ দুই-এর সম্মুখীন। সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক প্রবঞ্চনা ও অনাচার ভিড় জমিয়েছে এবং এখানে সুযোগসন্ধানীদের পোয়া-বারো—এ অবস্থায় সাহিত্যেও দায়িত্বহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও অসহিষ্ণুতা প্রবেশ করেছে এবং নৈরাজ্যিক চেতনা দেখা দিয়েছে।'[২০] খাজা আহমদ আব্বাস এ সময়েরই সাহসী শিল্পী। উদারনৈতিক সমাজতান্ত্রিক চেতনা আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাকে সে আসনে সমাসীন করেছে। 'জীবনের প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী চেতনার আলো নিয়ে যাঁরা শিল্পসাহিত্যের অলিন্দকে আলো করে রেখেছেন, তারা নিশ্চয় সাহসী।'[২১] নেতির মধ্য দিয়ে হলেও তাঁর রচনায় সঙ্গতির সন্ধান গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে এবং সন্দেহ নেই উর্দু ছোটগল্পের ইতিহাসে আলোর দিশারী ও সাহসী শিল্পী, অন্য কথায় শুভসঙ্গতির বাহক খাজা আহমদ আব্বাস। *রিটার্ন টিকেট* সে সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১. সৈয়দ মবনু, "উর্দু ভাষা-সাহিত্যের উৎস এবং ক্রমবিকাশ", *শব্দপাঠ* (আবুল মকসুদ সম্পাদিত),(মৌলভীবাজার : দশম সংখ্যা, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৫৩।
২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৮), পৃষ্ঠা ১।
৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ১।
৪. নেয়ামাল বাসির, *উর্দু সাহিত্য সঙ্কলন*, (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৭৯-৮০।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩।
৬. *রিটার্ন টিকেট* (জাফর আলম অনূদিত), (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭), ভূমিকা।
৭. মনির উদ্‌দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃষ্ঠা ৩৯৮।
৮. *রিটার্ন টিকেট* (জাফর আলম অনূদিত), পূর্বোক্ত, ভূমিকা।
৯. ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, (নদীয়া : ১৯৬২), পৃষ্ঠা ৩৪০।
১০. *রিটার্ন টিকেট*(জাফর আলম অনূদিত), পূর্বোক্ত, ভূমিকা।
১১. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, "উর্দু সাহিত্য", *ভাষা ও সাহিত্য*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৫৯৩।
১২. খাজা আহমদ আব্বাস, "রিটার্ন টিকেট", *রিটার্ন টিকেট* (জাফর আলম অনূদিত),(ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ১৪।
১৩. ....., "চড়ুই পাখী", পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮।
১৪. ....., "চড়ুই পাখী", পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩০।
১৫. ....., "অনুপমা", পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯।
১৬. ....., "দুই হাত", পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯।
১৭. ....., "চকলেট", পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪।
১৮. ....., "হাতের দাগ",পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬।
১৯. এ বি এম কামাল উদদীন শামীম, *তিন নারী*(অনুবাদ), (ঢাকা : বুক সোসাইটি, ১৯৮৩), অনুবাদকের কথা।
২০. নেয়ামাল বাসির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১০।
২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১০।